শতবার্ষিক স্মরণ

ইতিহাসের সামগ্রিকতা : অমলেশ ত্রিপাঠী

দেবাঞ্জন সেনগুপ্ত

মেদিনীপুর জেলার তমলুক (অধুনা হলদিয়া) মহকুমার থানার অধীনে শস্যশ্যামল দেভোগ গ্রাম। সেখানে ত্রিপাঠীদের গাছপালা ঘেরা বিশাল চকমিলানো বাড়ি। সাধারণ মানুষ তাকে সংগত কারণেই জমিদারবাড়ি বলে। বাড়ির কর্তা প্রবল প্রভাবান্বিত জমিদার শ্যামাচরণ ত্রিপাঠীর জমিদারি কিন্তু এখানে নয়, তিনি জমিদার বংশের সন্তানও নন। তাঁর বাবা জগবন্ধু ত্রিপাঠী ছিলেন ব্রিটিশ আমলের দাপুটে সল্ট ইন্সপেক্টর, স্থানীয় ভাষায় 'নিমকির দারোগা'। বাবা অকালে মারা যাওয়ায় শ্যামাচরণ পড়েন অথই জলে, এনট্রান্স পরীক্ষাটুকুও দেওয়া হয় না তাঁর। তবে তিনি কর্মবীর মানুষ। খবর পেলেন সুন্দরবন এলাকায় বন কেটে বসত হচ্ছে, ব্রিটিশ সরকার ওইসব এলাকায় জমি ইজারা দিচ্ছে। সেটা বিংশ শতকের প্রথম দিক। ২৪ পরগণার ভেতরে এমন এক এলাকায় তিনি জমির ইজারা পান। নব্য জমিদারি গড়ে তোলার কাজে তাঁর বাকি জীবন ভয়ানক ব্যস্ততায় কাটে। বছরের অর্ধেক সময়ই তিনি বাড়ির বাইরে।

ফলে ছোট ছেলে অমলেশ জন্মের (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২১) পর থেকে বাবার সঙ্গ পেতেন কম। মা আর দিদিদের নিয়ে দেভোগ গ্রামে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। তাঁরা সাত বোন, দুই ভাই। একমাত্র দাদা তাঁর চেয়ে বছর কুড়ি বড়। তিনি তমলুক শহরের উকিল, সেখানেই থাকতেন।

বাল্যবেলা[১]

অমলেশ অপেক্ষা করতেন কবে বাবা গ্রামে

আধুনিক ভারতের তিনি অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক। অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ। 'সামগ্রিক ইতিহাস' চর্চায় যুগান্তকারী অবদান—যেখানে অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজা-প্রজা—সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতকে বিচার করা হয়। বহু আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। আবার বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি নাড়ির টান। হ্যাঁ। তিনি অমলেশ ত্রিপাঠী। চলছে তাঁর শতবর্ষ।

আসবেন। বাবা রাশভারি মানুষ। তবু ''বাবা এলে বাড়িটাকে জমজমাট মনে হত।'' তাঁর সঙ্গে টানা কিছুদিন কাটানোর সুযোগ হল পঞ্চতীর্থ ভ্রমণে গিয়ে। তখন অমলেশ বছর পাঁচেক। ওই বয়সের আর কী-ই বা স্মৃতি! শুধু যমুনাতীরে কচ্ছপ দেখার কথা মনে থেকে গিয়েছিল। আর একান্ত ব্যক্তিগত কীর্তির সূত্রে কাশীর বানরের স্মৃতি। সেখানে একদিন তাঁর দিদিমা থালায় পুজোর ফল সাজিয়ে কোথায় যেন একটু গেছেন, ফিরে এসে দেখেন থালা খালি। তিনি বানরদের ওপর রাগারাগি করলেন, ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারলেন না তাঁর ফুটফুটে ছোট নাতি কখন সব ফল উদরস্থ করে মুখ মুছে ফেলেছে।

গ্রামে ঘুরে ঘুরে নানা ডানপিটেপনা করে আর বাবার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে তাঁর বাল্যকাল বেশ আনন্দেই কেটেছে। শুধু সন্ধে হলে একটু ভয়-ভয় করত। কারণ ছবছর বয়স থেকেই মাকে সন্ধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পড়ে শোনাতে হত। অবশ্য ঠোক্কর খেয়ে পড়তে পড়তে উচ্চারণ এবং ভাষা দুটোই রপ্ত হয়ে গিয়েছিল ওই বয়সেই। আর তৈরি হয়েছিল বই পড়ার আগ্রহ। পাশের গ্রামের জমিদার মশাইয়ের লাইব্রেরিতে গিয়ে পুরনো 'সন্দেশে'র ফাইল দেখতেন। তাছাড়া বাবা-মায়ের কাছে আবদার করে 'খোকা-খুকু', 'শিশুসাথী', 'মৌচাক' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। সেখানে বিজ্ঞাপন দেখে পছন্দের গল্পের বই আনানোরও কোনও বাধা ছিল না। কল্পবিজ্ঞানের কাহিনি, অ্যাডভেঞ্চারের গল্প, আফ্রিকার জঙ্গল ছিল অমলেশের আগ্রহের বিষয়।

তখন 'শিশুসাথী'তে ধারাবাহিকভাবে বেরোচ্ছে 'সাগরিকা'—জুলে ভার্নের 'টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস্ আন্ডার দ্য সি'-র অনুবাদ। সেবার বাড়ি ফিরে শ্যামাচরণবাবু দেখেন তাঁর বালক পুত্র কয়েক কিস্তি পড়েই তুমুল উত্তেজিত। তিনি বললেন, ''মূল বইটা আমার কাছে আছে, পড়বি?'' বাবার বইয়ের আলমারিতে সেই প্রথম অমলেশের প্রবেশাধিকার। দেখলেন সেখানে জুলে ভার্ন আর ওয়াল্টার স্কটের অনেক বই। বাবাও তাহলে অ্যাডভেঞ্চার বইয়ের ভক্ত! অমলেশ কথাটা বুঝতে পেরে খুবই খুশি হন। কাহিনির টানে ঝকঝকে নির্মাণের ইংরেজি বইগুলির দিকে এবার হাত বাড়ালেন।

সেই আলমারির সূত্রে পরিচয় ঘটল বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও। 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' তখন খণ্ডে খণ্ডে এঁদের রচনা সংগ্রহ বার করেছিল। শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে', 'দত্তা', 'পরিণীতা' শেষ করে অমলেশ পৌঁছলেন বঙ্কিম রচনাবলিতে। সংস্কৃত ঘেঁষা সাধুভাষায় অসুবিধে তো হচ্ছিলই। তবু এক্ষেত্রেও গল্পের টানে তরী তরতরিয়ে এগিয়ে গেল। ওই বয়সেই পড়া হয়ে গেল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব উপন্যাস। পরিণত বয়সেও প্রিয় উপন্যাসের কথা বলতে গেলে তিনি বলতেন ছেলেবেলায় পড়া 'রাজসিংহে'র কথা।

হাইস্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই এইভাবে বাংলা আর ইংরেজি ভাষাটা বেশ সড়গড় হয়ে গেল অমলেশের।

প্রস্তুতিপর্ব

সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করা হল তমলুকের হ্যামিলটন হাইস্কুলে। এই বিদ্যালয়ের সারস্বত পরিবেশ এক স্থায়ী ছাপ ফেলে অমলেশের মনে। সেখানের বহু শিক্ষককে তিনি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজীবন মনে রেখেছিলেন। যেমন ননী-স্যার, হেডপণ্ডিতমশাই, অমৃত-স্যার। গ্রামের ছেলেটিকে ইংরেজি ভাষায় পুরো চোস্ত করে দিয়েছিলেন এই ননী-স্যার। সেই সঙ্গে তাঁর আগ্রহ ছিল খেলাধুলো আর নাট্য-অভিনয়ে। হেডপণ্ডিতমশাই সংস্কৃত আর বাংলা পড়াতেন। পাঠ্যবিষয়ের গভীরে গিয়ে জ্ঞানের জগতটা কেমন করে বিস্তৃত করতে হয় সেটা

তাঁর কাছ থেকে শেখা। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' অংশটির রস ঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে যে রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' (প্রাচীন সাহিত্য) পড়ে নেওয়া দরকার সেকথা এই পিপাসু ছাত্রটিকে তিনিই শিখিয়েছেন। অমৃত-স্যার নিচু ক্লাসে ভূগোল পড়াতেন, উঁচু ক্লাসে মেকানিকস্, আর স্কাউটিং তাঁর দায়িত্বে। তাঁর কাছেই অমলেশের নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক 'স্কাউট' হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতে শেখা। তাই গুরুসদয় দত্তের প্রভাবে ১৯৩৪ সাল নাগাদ যখন স্কুলে 'স্কাউট' উঠে গিয়ে 'ব্রতচারী' এল, অমলেশ খুব দুঃখ পেয়েছিলেন।

পাঠ্যসূচি বহির্ভূত নানা ক্রিয়াকর্মে মেতে থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় কোনও গাফিলতি ছিল না অমলেশের। স্কুলে সব পরীক্ষাতেই প্রথম হতেন। কিন্তু সেটা নিয়ে বিশেষ সোচ্চার ছিলেন না শিক্ষক-অভিভাবক কোনও তরফই। তাই ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ফলাফল ভাল হবে এইটুকু আত্মবিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, কিন্তু সমগ্রের সাপেক্ষে কতটা ভাল সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না।

একদিন সন্ধেবেলা দেভোগের বাড়িতে বসে আছেন। এমন সময় তমলুকের উকিল দাদার কাছ থেকে একজন এল একটি পত্রিকা নিয়ে। তার একটি লাইনে লালকালি দিয়ে দাগানো : তমলুক হ্যামিলটন হাইস্কুল টপস্ দ্য লিস্ট। অমলেশের ভাষায় : ''ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে দারুণ চমকে গিয়েছিলাম, খবরটা হজম করতে সময় লেগেছিল।''[২] বাংলার সেরা ছাত্র হিসেবে কলকাতায় এসে অমলেশ ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। এখানে সত্যজিৎ রায়, সিদ্ধার্থশংকর রায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তাঁর সহপাঠী হলেন। আই এ বা ইন্টারমিডিয়েট আর্টস পরীক্ষায় (১৯৩৮) তিনি দ্বিতীয় হলেন। তাঁর প্রিয় শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পরামর্শ দিলেন, অমলেশ ইংরেজি নিয়ে পড়ুন। পরীক্ষার ফলাফল দেখে সেই সময়ের ইংরেজি বিভাগের বিশিষ্ট দুই অধ্যাপক তারকনাথ সেন এবং সুবোধ সেনগুপ্তও সেই একই কথা বললেন। কিন্তু অমলেশ ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সির ইকনমিক্স অনার্সে।[৩] বি এ পরীক্ষায় (১৯৪০) তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম হলেন। পথ বদলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি হলেন ইতিহাস নিয়ে। এম এ পাশ করলেন (১৯৪২) প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে। গবেষণায় কাজে লাগবে মনে করে আইন পড়তে ঢোকেন এবং এল এল বি পরীক্ষাতেও (১৯৪৩-৪৫) প্রথম হন।

এইসময় সংযুক্ত বঙ্গ সরকার (ইউনাইটেড বেঙ্গল গভর্নমেন্ট) অমলেশ ত্রিপাঠীকে স্টেট স্কলার মনোনীত করেন (১৯৪৬)। ১৯৫১ সালে ভারত থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম ফুলব্রাইট স্কলার মনোনীত হলেন অমলেশ। পি এইচ ডি ডিগ্রি অর্জন করলেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৫৪)। স্নাতক স্তরে অর্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনাকে কাজে লাগিয়ে তিনি এক নতুন ধারার গবেষণায় হাত দিলেন : অর্থনৈতিক ইতিহাস। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির ১৭৯৩-১৮৩৩ পর্বের ব্যবসা ও অর্থনীতি নিয়ে তাঁর সেই গবেষণা চিনিয়ে দিল নতুন যুগের এক মুক্তমনা গবেষককে, যিনি তাঁর প্রস্তুতিপর্ব সগৌরবে সমাধা করে প্রবেশ করলেন উজ্জ্বল কর্মজীবনে। অবশ্য অমলেশ ত্রিপাঠীর মতো মেধাজীবীর ক্ষেত্রে প্রস্তুতিপর্বে কোনও দাঁড়ি পড়ে না কখনও : The most remarkable feature of Tripathi's intellectual life was a sense of wonder. He never ceased to learn.[৪]

দরদি শিক্ষক

প্রত্যাশিতভাবে এই বিদ্যোৎসাহী মানুষটি অধ্যাপনার জীবনই বেছে নিলেন। মৌলানা আজাদ

কলেজে স্বল্পকালীন শিক্ষকতার কাজ শেষে তিনি যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সহকারী অধ্যাপক থেকে খুব দ্রুত তিনি বিভাগীয় প্রধান হন এবং দীর্ঘ কর্মকালে (১৯৫৭-৬৯) প্রেসিডেন্সির প্রবাদপ্রতিম ছাত্র-শিক্ষকদের তালিকায় নিজের স্থায়ী স্থান করে নেন। নিজের বিভাগের মধ্যে তাঁর প্রশ্নাতীত ছাত্রপ্রিয়তা তো ছিলই, সেইসঙ্গে অন্য বিভাগের ছাত্রদের কাছেও এই দীর্ঘাকৃতি, সুদর্শন, আপাতগম্ভীর অধ্যাপকের ক্লাস ছিল তীব্র আকর্ষণের কেন্দ্র। নিজেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন : ''ছেলেরা জানত আমি তাদের কী যত্ন নিয়ে পড়াই।... কলেজে প্রথমে পাস ক্লাসে পড়াতাম। তারা সব অন্য বিভাগের ভাল ভাল ছাত্রছাত্রী। পুরনো ধরনের ইতিহাস শুনবে না। তাই তাদের আকৃষ্ট করতে অর্থনৈতিক ইতিহাসের কথা বলতাম, সাহিত্য থেকে শিল্প নিদর্শন থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা শোনাতাম।''[৫] সর্বাধুনিক গবেষণা ও গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস অনার্সের নতুন পাঠ্যসূচি তৈরির বিষয়েও অমলেশবাবু অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯৬৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ অধ্যাপক (Ashutosh Professor of Medieval and Modern History) হিসেবে যোগ দেন এবং ১৯৮৬ সালে এই পদ থেকেই অবসর নেন। কুশলী, পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যাপনার সমান্তরালে তাঁর প্রধান অবদান ইতিহাস বিভাগের জন্য ইউ জি সি-র বিশেষ সহায়তা আদায়, বিভাগের জন্য হাজরা রোডে চারতলা বাড়ি তৈরি, বিভাগীয় লাইব্রেরি, পত্রিকা, বাৎসরিক সেমিনার, অতিথি বক্তৃতার ব্যবস্থা, এম লিট প্রবর্তন। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিনীত বক্তব্য : ''আমি যে এসব পরিকাঠামো তৈরি করতে পেরেছি তার জন্য [প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী] তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ও ইউ জি সি-র সভাপতি অধ্যাপক সতীশচন্দ্রের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে উপাচার্য ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সাহায্য স্মরণ করতেই হবে। আমার সহকর্মীরা অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। বাধা পাইনি তাও নয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে দিল্লি বা জে এন ইউ থেকে পিছিয়ে পড়তে দিইনি ১৯৬৯ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত—আমার বিভাগীয় প্রধান থাকার সময়।''[৬]

প্রশাসনিক কৃতিত্বের খুঁটিনাটি কথা থাক, বরং শুনি অধ্যাপক ত্রিপাঠী সম্পর্কে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ ছাত্র, অধ্যাপক ড. প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ : ''অনার্সে পড়েছি, এম এ-তে পড়েছি, তাঁর অধীনে গবেষণা করে পি এইচ ডি করেছি।... আশ্চর্যের কথা, তিনি দেখে গেলেন তাঁর বাল্যস্মৃতি-জড়িত দেভোগ গ্রামেই স্থাপিত হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে আমি অধ্যক্ষের পদে আসীন হয়েছি। ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে সস্ত্রীক ও সপুত্র হলদিয়ায় এসেছিলেন।... দেভোগের জমিদার শ্যামাচরণ ত্রিপাঠীর আদি বাসভূমিতে অধ্যক্ষ পদে তাঁরই ছাত্র আসীন এই দৃশ্য দেখে তিনি বুঝি তৃপ্তি পেয়েছিলেন।''[৭]

ঘটনাটি গভীর ব্যঞ্জনাবাহী। আদর্শ শিক্ষক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর সুযোগ্য ছাত্রদের এক উজ্জ্বল পরম্পরা তৈরি করে গেলেন—ইতিহাসকে সামগ্রিকতায় চর্চা করার পরম্পরা।

গবেষণার বহুমুখ

অমলেশ ত্রিপাঠীর ইতিহাস গবেষণা বুঝতে গেলে এই 'ইতিহাসকে সামগ্রিকতায় চর্চা' বিষয়টি প্রথমে বুঝে নেওয়া দরকার। ইতিহাস কি রাজা কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানকে কেন্দ্র করে রচিত হবে, না কি সাধারণ মানুষকে নিয়ে—ঐতিহাসিকদের এই দীর্ঘকালীন দোলাচলতা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি যে-সংহত উত্তর দিয়েছিলেন সেটিই এই প্রসঙ্গে

উদ্ধৃত করি : ''আমি মনে করি এই দুটো ধারাকেই যে-ইতিহাসবিদ মেলাতে পারেন তিনিই সার্থক ঐতিহাসিক। আমি সামগ্রিকতায় বিশ্বাস করি। রাজা, জনগণ, অর্থনীতি, সমাজনীতি—সবকিছু নিয়েই ইতিহাস। সেক্ষেত্রে বলতে পারো আমি ফরাসি ইতিহাসবিদ ব্রুদেলের অনুগামী।"[৮] অন্যত্র বলেছেন, ''আমার মনে হয় ইতিহাস ওরকম আলাদা আলাদা করে দেখা যায় না। একটা রাজনীতির ইতিহাস লিখলাম, একটা অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখলাম, ওভাবে হয় না, সমগ্র জিনিসটা মিলিয়ে দেখতে হয়।... নিশ্চয়ই অর্থনীতি আমাদের অনেকটা পর্যন্ত প্রভাবিত করছে। কিন্তু সংস্কৃতি, মানুষের চিন্তা, প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে আধুনিক সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব এ সবের একটা ভূমিকা আছে।"[৯] এখানেই অমলেশবাবুর ইতিহাস চর্চার বিশিষ্টতা।

অমলেশ ত্রিপাঠী

সেইসঙ্গে উল্লেখ করতে হবে তাঁর শেকড়ের প্রতি টানের কথা। ঐতিহাসিক জহর সেন বলেছিলেন, ''অধ্যাপক ত্রিপাঠী মনে করেন, ইতিহাস হল মানববিদ্যার হৃদয় এবং সমাজবিজ্ঞানের আত্মা।... মনে করেন, পশ্চিমী কাঠামোকে অসংশোধিত অবস্থায় ভারতে প্রয়োগ করলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। দরজা খোলা রাখতে হবে, কিন্তু মাটি থেকে পা সরে গেলে চলবে না... অধ্যাপক ত্রিপাঠীর অভিমত, The Soil is as important as the seed... . ঐতিহাসিকের কাজ নিছক অতীত রোমন্থন নয়। ঐতিহাসিক প্রশ্ন তুলবেন, বিশ্লেষণ করবেন, হয়তো বর্তমানের জন্য প্রাসঙ্গিকতা এবং ভাবীকালের ইঙ্গিতও তিনি খুঁজবেন।"[১০]

ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও এই আলোচনার শুরুতেই বলে নেওয়া দরকার। সেটি হল তাঁর চর্চার বহুমুখিতা। সংকীর্ণ অর্থে তিনি বিশেষজ্ঞ হতে চাননি। ইতিহাসের বিভিন্ন দিকে তিনি গবেষণা ও মননশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রাম, নবজাগরণ, মননের ঐতিহ্য এমন নানা বিষয়ে তাঁর অবাধ যাতায়াত। শেষ জীবনে খুব উৎসাহের সঙ্গে তিনি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনীতি, সমাজ নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন।

লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পি এইচ ডি পর্বে বঙ্গদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়ে তাঁর পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্রটি গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হল ১৯৫৬ সালে : Trade and Finance in the Bengal Presidency 1793-1833। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের অভিনবত্ব সঙ্গে সঙ্গে নজর কাড়ল বিদগ্ধজনের। এতই সপ্রশংস স্বীকৃতি পেল বইটি যে, অমলেশ স্থির করলেন আবার অর্থনৈতিক ইতিহাসই হোক তাঁর পরের গবেষণার বিষয়। ১৯৫৮ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রকফেলর ফেলো হিসেবে বিদেশে গিয়ে ভারতে কর্মরত বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, বীমা সংস্থা ও

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ওপর তিনি কাজ করতে চান। মেদিনীপুরের প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট স্যার পারসিভাল গ্রিফিথসের সঙ্গে অমলেশের পূর্বপরিচয় ছিল, তিনি কিছু চা কোম্পানির দলিলপত্র দেখার সুযোগ করে দিলেন। ''কিন্তু অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠানের কাছে গিয়েছি,'' অমলেশ স্মৃতিচারণ করেছেন, ''তারা বলেছে যে, তাদের ডকুমেন্টস তারা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি তখন ভাবলাম কী করা যাবে? শুধু সরকারি দলিলপত্রের ওপর ভিত্তি করে তো আর লেখা যায় না। বাণিজ্যিক ইতিহাসের জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির কাগজপত্র দেখা দরকার।''[১১]

তাহলে কি ধরে নিতে হবে অর্থনৈতিক ইতিহাসে ব্যর্থমনোরথ গবেষক বাধ্য হয়ে তাঁর চর্চাকে বহুমুখে বিকশিত করলেন? কথাটি অল্পাংশে সত্য। পূর্বোক্ত স্মৃতিচারণেই অধ্যাপক ত্রিপাঠী সেটি স্পষ্ট করেছেন : ''যখন দেখলাম ইকনমিক হিস্ট্রি লেখার কতকগুলি অসুবিধা আছে, তখন আমার মনে হল, খানিকটা ওই সাহিত্যের প্রতি দরদের জন্য, যে আমাদের দেশে তো মননের ইতিহাস বা হিস্ট্রি অব আইডিয়াস বলে কিছু নেই, সেটা চর্চা করলে একটা বড় ফাঁক পূরণ করা যাবে। আরও একটা জিনিস মনে হল। যদি সবগুলো—অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, মনন—একসঙ্গে দেখা যায়। সেই চেষ্টা করলাম আমার 'দ্য এক্সট্রিমিস্ট চ্যালেঞ্জ' বইটিতে।'' ১৯৬৭ সালে ওরিয়েন্ট লংম্যান থেকে প্রকাশিত হয় সেই বই—বঙ্গানুবাদে 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব' (১৯৮৭)।

সেই শুরু হল অধ্যাপক ত্রিপাঠীর 'টোটাল হিস্ট্রি' বা সামগ্রিক ইতিহাসের পথে যাত্রা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে নবজাগরণ বিষয়ে লেখেন 'বিদ্যাসাগর : ট্র্যাডিশনাল মর্ডানাইজার' (১৯৭৪)। আধুনিক দৃষ্টিতে হেরোডোটাস থেকে শুরু করে কালের বিশিষ্ট নানা ঐতিহাসিকদের কাজের মূল্যায়ন করেছেন তিনি তাঁর 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' গ্রন্থে (১৯৮৬)। বইটি 'আনন্দ সুরেশ স্মৃতি' পুরস্কার লাভ করে। এরপর আবার তিনি চোখ ফেরান ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে। লেখেন 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৫-১৯৪৭' শীর্ষক এক বিস্তারিত ইতিহাস (১৯৯০)। এই গ্রন্থের জন্য পান রবীন্দ্র পুরস্কার। মননের ইতিহাস নিয়ে তাঁর এক বিশিষ্ট কাজ 'ইতালির রেনেসাঁস, বাঙালির সংস্কৃতি' (১৯৯৪)। লিখেছেন 'স্বাধীনতার মুখ' (১৯৯৮)। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর ছড়িয়ে থাকা উৎকৃষ্ট কিছু কিছু প্রবন্ধ বিষয়ানুসারে সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে 'ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' বা 'নেতা থেকে নেতাজি'।

অমলেশবাবুর গ্রন্থতালিকা দেখলে তাঁর আর একটি বিশিষ্টতার কথা স্পষ্ট হয় : তিনি আধুনিক ভারতবর্ষের সেই বিরল গোত্রের আন্তর্জাতিক মানের পণ্ডিত যাঁরা নিজের মাতৃভাষায় লিখতেও সদা তৎপর; তিনি সেই লুপ্তপ্রায় বাঙালিদের একজন যিনি বাংলা ও ইংরেজি উভয় লেখ্য ভাষাতেই স্বচ্ছন্দ। তাঁর ইতিহাসের সন্দর্ভ—তা বাংলা বা ইংরেজি যে-ভাষাতেই লেখা হোক—যেন পণ্ডিতি তত্ত্ব আর তথ্যের চাপে 'শুষ্কং কাষ্ঠং' না হয়ে যায়, সে-বিষয়ে তিনি সদা সচেতন। লিখেছিলেন, ''History is not a high-faulting intellectual game. Readability is the sine qua non of good history, and no historian should forget that.''[১২] ইতিহাসের অবিশেষজ্ঞ পাঠকের আগ্রহ আকর্ষণে তিনি সদা সচেতন।

তাঁর এই ক্ষমতার পিছনে রয়েছে বিবিধ বিষয়ে তাঁর আন্তরিক আগ্রহ এবং দেশবিদেশের সাহিত্যপাঠের বিপুল অভিজ্ঞতা। এই প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন, ''আমি মনে করি আমি যত সাহিত্য পড়েছি বা পড়ি ভারতবর্ষের অন্য কোনও ইতিহাস রচয়িতা অত

সাহিত্য পড়েননি। যে কারণে, অনেকেই তথ্যবহুল ইতিহাসটা জানেন কিন্তু সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটা অতটা ভাল করে জানেন না...।"[১৩]

কতটা ভাল করে জানেন অমলেশবাবু? একটি উদাহরণ দিই। আধুনিক মানবসভ্যতার ইতিহাসে সংঘটিত বিবিধ রাজনৈতিক-সামাজিক বিপ্লব সম্পর্কে এক বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার শুরুতেই তিনি এক অভিনব ভাবনার অবতারণা করেন : ''রেভোল্যুশন শব্দটা এসেছে জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে। সপ্তদশ শতকের প্রথমে কোপারনিকাস, গ্যালিলিয়েরা যখন অ্যারিস্টটলবর্ণিত পৃথিবী-কেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা উলটে দিয়ে সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বের ধারণা প্রতিষ্ঠা করলেন, তখন সূর্যের চারদিকে গ্রহ ও গ্রহের চারদিকে উপগ্রহের বিশেষ কক্ষপথে আবর্তনের নাম দেওয়া হল—'রেভোল্যুশন'। তারপর অবশ্য তা প্রযুক্ত হল সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবের ক্ষেত্রে (যা রাজনৈতিক), শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্রে (যা অর্থনৈতিক), ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে (যা রাজনৈতিক ও সামাজিক)।"[১৪]

আবার জগৎজোড়া সার্বিক বিচ্ছিন্নতাবাদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, ''প্রথম প্রশ্ন, সহসা কেন্দ্রাতিগ শক্তি এত প্রবল হল কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সব দ্বন্দ্ব-বিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো, যে-ঐক্য, সংহতি, সমন্বয়ের দিকে আকর্ষণ—তা কেন কাজ করছে না? রবীন্দ্রনাথ 'জন্মদিনে' কাব্যে বহু আশায় বলেছিলেন, এ পাপযুগের অন্ত হলে,

'মানব তপস্বী বেশে/ চিতাভস্ম শয্যাতলে এসে/ নব সৃষ্টি, ধ্যানের আসনে/ স্থান লবে নিরাসক্ত মনে।'

''এ বিশ্বাস কি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হবে? জীবনানন্দ যে 'শুভ্র মানবিকতার ভোর' আশা করেছিলেন তা মিথ্যা, আর সুধীন্দ্রনাথের [দত্ত] উক্তি সত্য—

'অলাতচক্রে ঘুরে ঘুরে সংসার/ অনাদি অমাকে আনে আমাদের গোচরে'?"[১৫]

তাঁর সাহিত্যবোধের আর একটি উদাহরণ : জওহরলাল নেহরুর নির্মোহ মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি দার্শনিক গৌরচন্দ্রিকা করেন : "History sets up heroes to be demolished after their days. Historians love 'debunking'–pulling off the pretenders from their high pedestals, revealing tinsel behind trumpery and feet of clay encashed in steel."[১৬]

ইতিহাসের দাবি মেনে প্রতিষ্ঠিত হিরোকে তার ভণ্ডামির উচ্চ বেদি বা পেডেস্টাল থেকে নামিয়ে আনতে, তার দীর্ঘলালিত মূল্যহীন চাকচিক্য সরিয়ে তাকে অনাবৃত বা 'ডিবাঙ্কিং' করতে অমলেশবাবুও দায়বদ্ধ। কিন্তু সেই নেশায় তিনি যথার্থ মহাপ্রাণকে কদাচ অসম্মান করে ফেলেন না। বিশেষত বাঙালি নবজাগরণের প্রাণপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে তিনি অক্লান্ত।

মহাপ্রাণ-প্রণাম

অমলেশবাবু নিজেই আপশোস করেন : ''যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা যখন আসেন, আমরা ভালো করে চিনতে পারিনে তাঁদের। কেননা, আমাদের মন ভীরু অস্বচ্ছ, স্বভাব শিথিল, অভ্যাস দুর্বল। মনেতে সেই সহজ শক্তি নেই যাতে করে মহৎকে সম্পূর্ণ বুঝতে পারি, গ্রহণ করতে পারি। বারেবারে এমন ঘটেছে। যাঁরা সকলের বড় তাঁদেরই সকলের চেয়ে দূরে ফেলে রেখেছি।"[১৭] বুঝি সেই দোষস্খালনেই অধ্যাপক ত্রিপাঠী বাড়তি সচেতন, যোগ্য মহাপ্রাণকে শ্রদ্ধা জানাতে যেন তাঁর তরফে কোনও ত্রুটি না থেকে যায়।

অধ্যাপক ত্রিপাঠীর ভাষায় যিনি 'সচ্চিদানন্দ সম্বোধি শ্রীরামকৃষ্ণ'—তাঁর সম্পর্কে আলোচনায় ঐতিহাসিকের নিক্তিতে আবেগ ও যুক্তির আশ্চর্য ভারসাম্য : ''প্রত্যেক মিস্টিক সাধক কোনও একটি

বিশেষ পথে সাধনা করেন। আমাদের দেশেও কেউ করেন অদ্বৈত, কেউ দ্বৈত সাধনা। রামকৃষ্ণ ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি কোনও নির্দিষ্ট এক গুরুর কাছে বিশেষ কোনও যোগের মাধ্যমে শিক্ষাও নেননি। তাঁর অপরোক্ষানুভূতি শুধু আকুল বাসনা ও অন্ধকারে পথ হাতড়ানোর অসীম যন্ত্রণার সিদ্ধি। মির‍্যাকলের কথা বিশ্বাস করতে গেলে বলতে হয়, প্রথম পর্বে স্বয়ং ভবতারিণী ছিলেন তাঁর গুরু। দ্বিতীয় পর্বে এলেন ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরীরা। কিন্তু তাঁরা রামকৃষ্ণের স্বকীয় সাধনার উপলব্ধিকে শাস্ত্রীয় মতে পরীক্ষা করে দেখেছেন মাত্র। পরীক্ষায় এত অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন রামকৃষ্ণ, যে গুরুরাও নির্বাক। দ্বিতীয়ত সাধকরা সিদ্ধিলাভ করলে অন্য পথে সাধনার চেষ্টা করেন না, তাঁদের কাছে সেই পথটাই অনন্য ও একমাত্র সত্য। রামকৃষ্ণ কিন্তু তা করেননি। ঠিক বৈজ্ঞানিকের মতো নানা মত, নানা পথে পরীক্ষা করে একই অপরোক্ষানুভূতি লাভ করা যায় কিনা তাও দেখেছেন। 'যত মত তত পথ' কোনও কবি-কল্পনা নয়, তা নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শক্তিসাধনা, জ্যোতির্দর্শন, মহাভাব, তন্ত্র, অদ্বৈত—নানা experiment করে পাওয়া সত্য।"[১৮]

স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ উপলক্ষ্যে আলোচনার শুরুতেই অধ্যাপক ত্রিপাঠী জানিয়েছেন : ''১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের স্বামীজীর শিকাগো ভাষণ শুধু সনাতন ধর্ম দর্শন (যাকে লিবনিজ perennial philosophy আখ্যা দিয়েছেন)-এর পুনরুক্তি ছিল না, ছিল পশ্চিমী সভ্যতার অভিঘাতের উত্তরে আধুনিক ভারতের প্রতিক্রিয়া। একদিক থেকে তা রামকৃষ্ণ মুখ নিঃসৃত সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়বাণী, অন্যদিকে তা তাঁরই প্রিয়তম ও প্রাজ্ঞতম শিষ্যের কঠোর অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তববাদী, মানববাদী, প্রগতিবাদী ভাষ্য।... গুরুশিষ্যের যুগলবন্দী শিকাগোর বিভিন্ন বক্তৃতায় ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত।"[১৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ আলোচনা প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অমলেশবাবু স্বীকৃতি জানিয়েছেন ভগিনী নিবেদিতাকে : ''Acclaimed or derided as 'oriental', the spirit and technique of the [Bengal Art] school of Abanindranath Tagore owed much to the direct inspiration of sister Nivedita and, through her, to the rediscovery of Indian art by Vivekananda."[২০]

গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানান : ''যেন মনে রাখি—'আমার জীবনই আমার বাণী'। সে জীবন ছিল সরল, স্বাবলম্বী, সৎ। তার কেন্দ্রে ছিল গ্রাম। তার লক্ষ্য ছিল স্বল্পে সন্তুষ্টি, স্বয়ম্ভরতা, সহযোগিতা, স্বায়ত্তশাসন। রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে যোগ করতেন—সৌন্দর্যপ্রিয়তা। তা-ও যে গান্ধীর ছিল না তা নয়, তবে সে কবির নয়, ঋষির।"[২১]

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সুভাষচন্দ্র-বিরোধী গোষ্ঠীর কূটকর্ম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার শেষে তিনি কিছুটা আবেগাপ্লুত ভাষায় উপসংহার টানেন : ''একদিক দিয়ে তাঁরা সুভাষের উপকারই করলেন। যিনি ছিলেন নেতা, তিনি হলেন নেতাজী। এবার আর হলওয়েল মনুমেন্ট নিয়ে ঘোলা জলের রাজনীতি নয়। কলকাতা থেকে কাবুল, কাবুল থেকে বার্লিন, বার্লিন থেকে সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর থেকে কোহিমা—দুর্গম পথ তাঁর চরণচিহ্ন সগৌরবে ধারণ করল। এই বীরকেই তো তার শূন্য আসন পূর্ণ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।"[২২]

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ। গান্ধীর প্রসঙ্গেও, নেতাজীর প্রসঙ্গেও। রবীন্দ্রনাথের কাছে একান্ত নির্ভরতায় আর আনুগত্যে অমলেশ ফিরে ফিরে আসেন। 'ফিরে যেতে হয় তাঁর কাছেই' এই স্বীকারোক্তিমূলক শিরোনামেই তিনি লিখেছেন, ''তাঁরাই সৎ কবি যাঁরা অনেক যুগের জন্য, অনেক মানুষের জন্য

লেখেন। সেফোক্লেস, দান্তে, শেকসপিয়র, গ্যোয়াটে, রবীন্দ্রনাথের মতো কবি পেতে গেলে একটা দাম দিতে হয়, সে তাঁদের অনন্যতা। পরবর্তী কবিরা বিরূপ হন, কারণ বিপন্ন হন। কিন্তু মহাকবিরা যাঁদের মাতৃভাষায় লেখেন তাঁরা দার্শনিকই হোন, বৈজ্ঞানিকই হোন, রাজনৈতিক নেতাই হোন আর সাধারণ মানুষই হোন, তাঁরা সুখের দিনে, দুঃখের রাতে, মিলনের আনন্দে, বিরহের যন্ত্রণায়, বাইরের সংগ্রামে, অন্তরের সাধনায় আত্মোপলব্ধির (তা যতই অস্পষ্ট হোক) ও আত্মপ্রকাশের (তা যতই অবিদগ্ধ হোক) ভাষা পেয়ে যান। রবীন্দ্রনাথ অনন্য কারণ তাঁর কাব্যেই পাই মানুষের সমস্ত সত্তাকে, যা সহজ অথচ মহান, পাই প্রকৃতিকে, যা নিত্য ফোটাবার জন্য নিত্য ঝরায়, পাই ঈশ্বরকে, যিনি 'জানেন যে কোনো স্বাধীন পথ দিয়ে চলি না কেন আমি, তা ঠিক পৌঁছে দেবে তাঁরই কাছে'।"[২৩]

শেষ নেই যার

১৮ জুন ১৯৯৮ অমলেশ ত্রিপাঠীর জীবনাবসান। পরদিন আনন্দবাজার পত্রিকায় শোকসংবাদ প্রকাশিত হয় : ''প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অমলেশ ত্রিপাঠী বৃহস্পতিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। বেশ কিছু দিন ধরে তিনি ফুসফুসের সংক্রমণে ভুগছিলেন। এদিন রাত ১১টা নাগাদ সল্টলেকে চিকিৎসক-কন্যার বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়। অমলেশবাবুর স্ত্রী ও এক ছেলে ও মেয়ে বর্তমান।''

অমলেশবাবুর চূড়ান্ত পরিচয় তিনি 'প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ' ঠিকই। কিন্তু ১৯৩৪ বঙ্গাব্দে আনন্দ পুরস্কারের মানপত্রে যে লেখা হয়েছিল, ''স্বদেশের অতীতই আপনার গবেষণার মূল বিষয়, এবং আত্মবিস্মৃত এই জাতিকে অত্যন্ত নির্মোহ ভঙ্গিতে তার অতীত-ইতিহাসের কথাই আপনি শুনিয়েছেন'' —জীবনের শেষ দশকে এসে অধ্যাপক ত্রিপাঠী আর এই পরিচয়ে বাঁধা ছিলেন না। শুধু অতীতচারণ নয়, এই পর্বে তিনি গভীরভাবে ভেবেছেন তাঁর সমসময়কে নিয়েও, লিখেছেন সেই বিষয়ে একের পর এক প্রবন্ধ।

তিনি সাবধান করছেন : ''বিজ্ঞান প্রযুক্তি, ভোগ্যপণ্যের বাহুল্য ও চাকচিক্যে মানবিক মূল্যবোধের সার্বিক অবক্ষয় ঘটছে।... মানুষ যদি ক্রমাগত ছোট হতে থাকে, তবে কোনও উপায়ই আমাদের দেবতার স্তরে পৌঁছে দেবে না। ক্ষমতা ও লোভের অপব্যবহারে মানুষের অপমানিত আত্মা বিদ্রোহ করবেই। বিদ্রোহ যদি ব্যাপক হয়ে বহুশ্রেণিকে সংহত করতে পারে, তবে বিপ্লব আসবে।"[২৪] তিনি বলেছেন, ''হিন্দু জাগরণ হোক, কিন্তু তার চেয়ে বড় মনুষ্যত্বের জাগরণ। মনুষ্যত্ব বাদ দিয়ে হিন্দুত্ব কেন, কোনও সত্যকার ধর্ম কল্পনা করা যায় না। একথা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—সব শ্রেষ্ঠ মনীষীরা বুঝেছিলেন, যেমন তার আগে বুঝেছেন যাজ্ঞবল্ক্য, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীররা।"[২৫]

আর এই স্বপ্নের জাগরণের পথে অমলেশবাবুর পূর্ণ ভরসা নতুন প্রজন্মের প্রতি। এমনকী 'কেন বারবার ছাত্ররা বিদ্রোহী' এই অভিযোগের উত্তরেও তাঁর বিশ্বাস ও প্রশ্রয় তাদের প্রতিই : ''ছাত্ররা অনেক বেশি সমাজচেতন। তার কারণ হিসেবে বলা যায়, ছাত্ররা অল্পবয়স্ক এবং তাদের সামনে ভবিষ্যৎ আছে অর্থাৎ ভবিষ্যতের সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত। আর ছাত্ররা একটু বেশি স্পর্শকাতর হয়ে থাকে। এবং তাদের টগবগে যৌবনের ফলে অনুভূতিগুলোও অনেক বেশি তীব্র ও তীক্ষ্ণ। লেখাপড়াও অন্য শ্রেণীর থেকে—যেমন, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর থেকে অনেক বেশি ও পরিশীলিত। যাকে আমরা পুরোপুরি বুদ্ধিজীবী কিংবা বয়স্ক বুদ্ধিজীবী বলি, তাদের মতো ছাত্ররা পাকা হয়ে ওঠেনি বটে কিন্তু তারা অনেক বেশি সৎ। আর

যেহেতু তাদের কাছে ভবিষ্যৎটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সেই হেতু তারা পরিবর্তনের কথাটা সবচেয়ে বেশি চিন্তা করে।"[২৬]

এই পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে তোলার জন্য তিনি অঙ্কুর থেকে কাজ করার নিদান দিয়েছেন : "প্রতিকূল পরিবেশ, বিষম সমাজব্যবস্থা, দায়িত্বহীন মিডিয়া—সবাইকে দায়ী করেও কিছু করণীয় রয়ে যায়। নিজেদের ছোট (আণবিক) সংসারটাকেই কি শান্তিময় করতে পেরেছি? এই আমার কাছে বড় প্রশ্ন।

"চেষ্টা শুরু করতে হবে সদ্যোজাত শিশুকে দিয়ে (কী তারও আগে জায়মান শিশুর মাতাকে দিয়ে)। তাকে ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখুন; পড়ায়, খেলায়। কাজে সৃষ্টির আনন্দ দিন; সকলের সঙ্গে মিলে মিশে ছোট ছোট স্বার্থত্যাগ করে চলার শিক্ষা দিন।... নিজেরা শান্ত থেকে তাকে শান্তি শেখান। সে নাই বা হল নববঙ্গের নবযুগের চালক—এক ধীর, স্থির, সহানুভূতিশীল, সৎকর্মী, নাগরিকই হোক।"[২৭]

বোঝাই যায়, জীবনের এই পরিণত পর্বে এসে তাঁর ভূমিকা যতটা না নির্মোহ ঐতিহাসিকের, তার চেয়ে বেশি মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিক্ষকের। বেপথু সমাজের ধৈর্যশীল আচার্য যেন তিনি, যাঁর প্রাসঙ্গিকতা শতাব্দী পেরিয়ে গেলেও কমার নয়।

ঋণস্বীকার

১। আনন্দবাজার পত্রিকা গ্রন্থাগার।
২। অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ।

তথ্যসূত্র

১। *আমার ছেলেবেলা*, আনন্দমেলা, ১১ মে ১৯৮৮
২। তদেব
৩। *রবিবাসরীয় সাক্ষাৎকার*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ এপ্রিল ১৯৮১
৪। *Obituary*, The Telegraph, 23 June, 1998
৫। *সাক্ষাৎকার*, দেশ, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯০
৬। তদেব
৭। *গণশক্তি*, ১৮ জুন ১৯৯৯
৮। *বইপাড়া*, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১১ জুলাই ১৯৯২
৯। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯ এপ্রিল ১৯৮১
১০। *দেশ*, ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯০
১১। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৯ এপ্রিল ১৯৮১
১২। *The Telegraph*, 4 June 1995
১৩। *বইপাড়া*, সাপ্তাহিক বর্তমান, ১১ জুলাই ১৯৯২
১৪। *বিপ্লব দীর্ঘজীবী নয়*, দেশ, ২২ অক্টোবর ১৯৯৪
১৫। *ভঙ্গুর এই বিশ্বে*, দেশ, ২ জানুয়ারি ১৯৯৩
১৬। *Nehru-myth and reality*, The Statesman, 15 August 1989
১৭। *গান্ধীজীর প্রাসঙ্গিকতা*, দেশ, ২১ অক্টোবর ১৯৯৫
১৮। *সচ্চিদানন্দ সম্বোধি শ্রীরামকৃষ্ণ*, দেশ, ১ জানুয়ারি ১৯৯৪
১৯। *'শিকাগো বক্তৃতার একশো বছর'* ক্রোড়পত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩
২০। *Bengali Culture : the 19th Century Renaissance*, The Statesman, 7 January 1990
২১। *আমরা আরও অকৃতজ্ঞ হয়েছি*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২ অক্টোবর ১৯৯৪
২২। *নেতা থেকে নেতাজি*, দেশ, ১৩ জানুয়ারি ১৯৯৬
২৩। *ফিরে যেতে হয় তাঁর কাছেই*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ আগস্ট ১৯৯১
২৪। *বিপ্লব দীর্ঘজীবী নয়*, দ্রঃ ১৪ নং তথ্যসূত্র
২৫। *হিন্দু জাগরণ*, দেশ, ১২ মার্চ ১৯৯৪
২৬। *কেন বারবার ছাত্ররা বিদ্রোহী*, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ জুন ১৯৮৯
২৭। *যুদ্ধ ও শান্তি*, দেশ, ১২ আগস্ট ১৯৯৫